কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রঃ খাদ্য ও কৃষি

Kautilya's Arthashastra : Food and Agriculture

শ্রী মনোরঞ্জন দে, (ঢাকা)

(পূর্ব প্রকাশের পর)

কৃষি উৎপাদন মূলত নির্ভর করে উন্নতমানের বীজ, জলসেচ সুবিধা এবং উন্নতমানের সার প্রয়োগের উপর। তদুপরি অনাবাদী জমি চাষাবাদের আওতায় আনিতে পারিলেও উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব। কৌটিল্য কৃষির এইসব দিক সম্পর্কে উদাসীন বা অনবহিত ছিলেন না।

কৌটিল্যের সময় বর্তমান যুগে প্রচলিত জলসেচ সুবিধা ভোগ করার উপায় ছিল না। কেননা তৎকালীন সময়ে বর্তমান যুগের মত সেচ যন্ত্রপাতি থাকার প্রশ্নই উঠে না। এইজন্য ঐ সময়ে জলসেচের জন্য মূলত বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভর করিতে হইত। তাই কৌটিল্য প্রথমত দেশের বিভিন্ন স্থানের গড় বৃষ্টিপাতের তথ্য সংগ্রহের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। আবার দেশের যে সব অঞ্চলে অত্যধিক এবং সবচাইতে কম বৃষ্টিপাত হয়, সেখানকার তথ্য সংগ্রহের জন্য সুপারিশ করেন। এবং পর, কোন্ অঞ্চলের মাটি কি ধরনের শস্য উৎপাদনের জন্য উপযোগী সে সম্পর্কে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে জরীপ করার উপর জোর দেন। কোন্ ফসলের জন্য কি পরিমাণ জলের প্রয়োজন তাহা নমুনা জরীপের সাহায্যে নির্ধারণ করা হইত। এইসব তথ্য সংগ্রহের পর পরিকল্পিত উপায়ে জলসেচ সুবিধা বন্টনের জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে উদ্যোগ গ্রহণের উপর তিনি জোর দেন। যে সব অঞ্চলে বৃষ্টিপাত প্রয়োজনের তুলনায় কম হইত সেখানে রাষ্ট্রীয় খরচে খাল, ইদারা/কুয়া এবং পুষ্করিণী/দীঘি খননের সুপারিশ করেন। বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা কোন্ অঞ্চলে কখন বেশী হইবে তাহা পূর্বাহ্নে আঁচ করার জন্য কৌটিল্য জ্যোতিঃবিদ্যা গবেষণার উপরও গুরুত্ব আরোপ করেন। এই ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় খরচে জ্যোতিঃবিজ্ঞানী নিয়োগ করা হইত। তাহাদের কাজ ছিল বিভিন্ন নক্ষত্রের অবস্থান নির্ধারণ করা এবং উহার ভিত্তিতে দেশের বিভিন্ন স্থানে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা নিরূপণ করা। এই ব্যবস্থা আধুনিক যুগের আবহাওয়া দফতরের সাথে তুলনীয়। সুতরাং প্রাকৃতিক উপাদান বৃষ্টিপাত অনিশ্চিত থাকা সত্ত্বেও কৌটিল্য উহার পূর্বাভাসের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এই কারণে যে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনার উপর ফসল বুননের সময় নির্ধারণ করা সহজতর হইবে। পাঠক! আধুনিক যুগে তৃতীয় বিশ্বের অনেক অনুন্নত দেশে যেখানে কৃষি মূলত বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীল সে সব দেশেও কৌটিল্যের কথিত উপরোক্ত ব্যবস্থা পর্যন্ত নাই। সুতরাং মৌর্য যুগের সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন কাঠামোর অধীনে প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল কৃষির জন্য জলসেচের উপরোক্ত ব্যবস্থার চাইতে আর কি উন্নত ব্যবস্থা প্রবর্তন করা সম্ভব ছিল ?

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উন্নতমানের বীজ এবং সার প্রয়োজন। কৌটিল্যের সময় সাধারণত উন্নতমানের বীজ বপনের উপর রাষ্ট্রীয়ভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হইত। রাষ্ট্র দেশের বিভিন্ন স্থান হইতে করের আকারে বিভিন্ন ধরনের শস্যবীজ সংগ্রহ করিয়া সংরক্ষণ করিত এবং প্রয়োজনের সময় কৃষকদের মধ্যে এই শস্যবীজ বিতরণ করা হইত। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৌটিল্য প্রয়োজনবোধে কম মূল্যে শস্যবীজ বপনের সুপারিশ করেন। তাঁহার সময়ে খরা-পীড়িত অঞ্চলে তাই রাষ্ট্রীয়ভাবে কম মূল্যে শস্যবীজ বিতরণের ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। সাধারণ কৃষকরা উদ্বৃত্ত শস্যের মধ্য হইতে বাছাই করিয়া পরবর্তী সময়ে বপনের জন্য শস্যবীজ বাড়ীতে সংরক্ষণ করিত। তৎকালীন সময়ে কৃষকরা বীজ বপনের পূর্বে উহা রাত্রিতে শিশিরে সিক্ত করিয়া দিনের বেলা রৌদ্রে শুকানোর ব্যবস্থা করিত। পর পর কয়েক দিন এই ব্যবস্থা নেওয়ার পর চারাগাছ তৈরীর জন্য তাহা বীজতলায় বপন করিত। চারাগাছ একটু বড় হইলে তাহা তুলিয়া আবাদী জমিতে চূড়ান্তভাবে রোপণ করিত। এই ব্যবস্থা আধুনিক যুগেও অনেক দেশের কৃষিখাতে পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং মৌর্যযুগে বীজ সংরক্ষণ এবং উহা বপনের যে ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল তাহা তৎকালীন সময়ের সামন্ত-তান্ত্রিক কৃষি কাঠামোতে অত্যন্ত আধুনিক ছিল বলা যায়। উন্নতমানের বীজের পাশাপাশি কৌটিল্য জমিতে উত্তম সার ব্যবহারের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁহার সময়ে গোবর, পচাপাতা, আবর্জনা কৃষি উৎপাদন কাজে বহুল-পরিমাণে ব্যবহৃত হইত। পণ্যের উৎপাদন ক্ষেত্রে rotation ব্যবস্থা প্রচলিত থাকায় জমির মৌলিক উর্বরতা শক্তি হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা কম ছিল। উপরোক্ত ধরনের জৈবিক সার যে মাটির কাঠামোগত গুণাগুণ বৃদ্ধিতে সহায়ক তাহা আধুনিক যুগের কৃষি বিজ্ঞানীরা অপকটে স্বীকার করেন।

অনাবাদী জমি চাষাবাদের আওতায় আনা কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির একটি অন্যতম পূর্বশর্ত। কৌটিল্যের সময় এই বিষয়টির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। রাষ্ট্র ব্যাপক পর্যায়ে অনাবাদী জমিকে চাষাবাদী জমিতে রূপান্তরের উদ্যোগ নেয়। মানুষ যাহাতে নিজের উদ্যোগে অনাবাদী জমিকে চাষাবাদের জন্য উপযুক্ত করিয়া গাড়য়া তোলে সেজন্য রাষ্ট্র বিভিন্ন ধরনের আর্থিক উৎসাহ প্রদানের ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। রাষ্ট্র যে-সব জমি চাষাবাদের জন্য তৈরী করিত তাহা কৃষকদের মধ্যে নির্দিষ্ট কর প্রদান সাপেক্ষে বন্দোবস্ত দেওয়া হইত। শর্ত থাকিত এই যে এইসব কৃষক রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত জমির সদ্ব্যবহার করিবে, অর্থাৎ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করিবে। যেসব কৃষক এই ব্যাপারে অবহেলা করিত, পরবর্তী সময়ে রাষ্ট্র তাহাদের নিকট হইতে জমি নিয়া অধিক পরিশ্রমী কৃষকদের নিকট বিলি করিত। সুতরাং দেখা যায় কৌটিল্য সরকারী জমি শর্ত-হীনভাবে বিলিবন্টনের সপক্ষে ছিলেন না। আধুনিক যুগে অনেক দেশে আমাদের বাংলাদেশ-সহ খাস জমি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে সরকার জনগণের মধ্যে বিলিবন্টন করেন। এই বন্টনের সময় মূলত সরকারী রাজস্ব আয়ের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়, বিলিকৃত জমির সদ্ব্যবহার হইবে কিনা, তাহা উৎপাদন বৃদ্ধিতে কতদূর ব্যবহার হইবে, ইত্যাদি বিষয়ে

মোটেই গুরুত্ব দেওয়া হয় না। এইজন্য অনেক সময় বিলিকৃত জমিজমা উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত না হইয়া অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। তদুপরি অর্থ যেখানে মুখ্য সেখানে প্রকৃত পরিশ্রমী চাষীরা সরকারী খাস জমি পাওয়ার ব্যাপারে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়। ফলে অনুৎপাদক শ্রেণীর হাতে পড়িয়া সরকারী খাস জমির যে কত অপব্যবহার হয় তাহার অসংখ্য উদাহরণ বাংলাদেশ হইতেই দেওয়া যাইবে।

কৌটিল্যের সময় যে-সব কৃষক অনাবাদী জমিকে নিজের অর্থে আবাদী জমিতে রূপান্তর করিত তাহাদেরকে ঐ জমি নিজের মালিকানায় রাখার অধিকার রাষ্ট্র প্রদান করিত। এমন কি বংশপরম্পরায় তাহা ভোগ করার অধিকারও এক্ষেত্রে প্রদান করা হইত।

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির একটি অন্যতম অন্তরায় হইতেছে এই যে অনেক ক্ষেত্রে চাষাবাদের জমি এমন লোকদের হাতে থাকে যাহারা প্রকৃত কৃষক নয়। আমাদের দেশে বৃটিশ আমলে জমিদারী প্রথার অধীনে এই ধরনের লোক গ্রামাঞ্চলে বেশী ছিল। এইসব লোক কৃষিকাজে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকে না। অন্যের নিকট জমি ভাড়া বা বর্গা প্রথার মাধ্যমে কৃষিখাতে তাহারা পরোক্ষভাবে জড়িত থাকে। ফলে কৃষি উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে ব্যাহত হয়। বৃটিশ আমলের জমিদারী প্রথা বর্তমানে এই দেশে না থাকিলেও জোতদারী, মহাজনী এবং বর্গাদারী প্রথার মাধ্যমে তাহার জের এখনও আমাদের কৃষিতে উল্লেখযোগ্যভাবে বিরাজমান। তৃতীয় বিশ্বের অনেক উন্নয়নশীল দেশের কৃষিতেই উপরোক্ত ধরনের "অনুপস্থিত মালিকানা" আছে। এইসব দেশের বিভিন্ন গবেষক এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানের রিপোর্ট ও জরীপ হইতে এই বক্তব্যের সমর্থন মিলিবে।

কৌটিল্য কৃষিতে এইরূপ "অনুপস্থিত মালিকানার" কঠোর বিরোধী ছিলেন। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে তিনি এই ধরনের লোকদের জমি রাষ্ট্র কর্তৃক বাজেয়াপ্ত করণের সুপারিশ করেন এবং বাজেয়াপ্ত জমি কঠোরভাবে পরিশ্রম করিতে আগ্রহী প্রকৃত কৃষকদের মধ্যে বন্টনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। বাজেয়াপ্ত জমি বন্টনের পর রাষ্ট্রের হাতে অতিরিক্ত জমি থাকিলে তাহা স্থানীয় কৃষি শ্রমিকদের সাহায্যে সরাসরি চাষাবাদের ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। রাষ্ট্রীয় জমি যাহাদেরকে চাষাবাদের জন্য প্রদান করা হইত তাহারা যদি উৎপাদনে শৈথিল্য প্রকাশ করিত তবে সেক্ষেত্রে রাষ্ট্র উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দাবি করিতে পারিত। সুতরাং দেখা যায় কৌটিল্য জমির বন্টন ব্যবস্থার পাশাপাশি উৎপাদন বৃদ্ধির দিক অবহেলা করেন নাই, যেমনটি দেখা যায় আধুনিক যুগের অনেক উন্নয়নশীল দেশে। কৌটিল্যের এই দ্বৈত নীতি বর্তমান যুগে অনেক দেশের নিকট শিক্ষণীয় একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।